যে মাটি কথা কয়!

ডাঃ এম, এ শুকুর এম, বি, বি, এস (মরহুম)

আমাদের জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে সব ঘটনা বা দুর্ঘটনা ঘটে, তার প্রত্যেকটির পিছনে যেমন আমাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক কর্মকান্ড দায়ী থাকে, তেমনি এর নিয়ন্ত্রণে ঐশী হস্তক্ষেপকেও অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। এই প্রেক্ষিতে এখানে পাক কুরআনের দু'টি আয়াতের উল্লেখ করছি।

*এবং তারা চক্রান্ত করেছিল এবং আমিও চক্রান্ত করেছিলাম, আর আমিই শ্রেষ্ঠতম পরিকল্পনাকারী (সুরা আল-ইমরান)।
* এবং তাদের মধ্য হতে, যারা এখনও সত্যকে গ্রহণ করে নাই। আর তিনিই সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞানী (সুরা জুম'আ)।

প্রশ্ন হল এরা কারা? কোন ভুখন্ডে এদের বাস। এবং কোন সে যুগ, যে যুগে ওরা বেরিয়ে আসবে? ঘটনাটি আগাগোড়া রহস্যাবৃত। তাই এ সম্বন্ধে যথাযোগ্য পর্যালোচনার প্রয়োজন। প্রথমোক্ত আয়াতের উপলক্ষ ছিল, বর্তমান বিশ্বের যাবতীয় অশান্তি, যুদ্ধ সংঘাত সংঘর্ষ ও শোষণ বঞ্চনার প্রধান হোতা বিশ্ব ইহুদীবাদী কু-চক্রীদের চক্রান্ত। আগামীতে এদেরও ধ্বংস যে অবধারিত হয়ে আছে, তারই ইশারা ও ইঙ্গিত ছিল উপরোক্ত আয়াতের মাঝেই।

দ্বিতীয় আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার সময় বিশ্বনবীর কাছে কিছু সংখ্যক সাহাবী উপস্থিত ছিলেন। স্বভাবতঃ তাদের মনেও প্রশ্ন জেগেছিল। তাই হযরত আবু হুরায়রা প্রশ্ন করেছিলেন ইয়া রসুলুল্লাহ এরা কারা? রসুলুল্লাহ নীরব রইলেন। তিন তিনবার প্রশ্ন করার পরে বিশ্বনবী তারই পাশে উপবিষ্ট সালমান ফার্সির কাঁধে হাত রেখে বললেন, "এদেরই মধ্য হতে"। এর তাৎপর্য হল, - এমন একদিন আসবে যখন পৃথিবীর সকল চত্বর থেকে সত্য বিলীন হয়ে যাবে, আর ঠিক তখনই এই ইরানীদের বংশধারা থেকে এমন কিছু লোক বেরিয়ে আসবে, যারা কুরআনের আলোকে সত্যকে আবারও পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবে! এরও অনেক পরে, সাতশ বছর আগের কথা। একটি ভুখা চিল, একজন নিষ্ঠুর রাজা এবং এক টুকরা মাংস। এ নিয়ে বর্তমান বাংলাদেশের পুর্ব উত্তর এলাকার সিলেটের মাটিতে তিন তিনটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল।

চিলের থাবা থেকে মাংসের টুকরা পড়ে যাওয়া এ-ও কি সম্ভব? পড়ে গেলেও তা আকাশের বুকে তার ছোঁ মেরে নিয়ে যাওয়ার কথা। এমন কি যে চিল জমিন থেকে মাংসের টুকরো ছোঁ মেরে নিতে পেরেছিল, জমিনে পড়ে যাবার পরেও সে তা পুনরায় তুলে নিতে পারত। কিন্তু যা হয়না তাই হল। চিলের ছোবল থেকে মাংসের টুকরো পড়ে গেল এবং সে আকাশে বা জমিন থেকে তা পুনরায় ছো মেরে তুলে নিল না। আর মাংসের টুকরোটি পড়ল-ই বা কোথায়? গো হত্যার ঘোরতর বিরোধী রাজার প্রাসাদের অঙ্গানে। অন্য কোথাও তা পড়তে পারত। কিন্তু তা হলে তিন তিনটি যুদ্ধ হত না, রচিত হত না ইতিহাস। কিন্তু সমগ্র বিশ্ব জাহানের নিয়ন্তা যিনি, তিনি চাচ্ছিলেন একটি নতুন ইতিহাসের সুচনা হোক। তাই যা ঘটে না, তা-ই ঘটল।

বুরহানুদ্দিন নামে এক সাধু, বাস করতেন তদানিন্তন গৌড়ে। তিনি তার নবজাত পুত্রের আকিকা উপলক্ষে একটি গরু জবাই করেছিলেন। একটি চিল তা থেকে এক টুকরা মাংস ছোঁ মেরে নিয়ে যায় এবং গৌড়ের রাজবাড়ীর অঙ্গানে ফেলে দেয়। এ নিয়ে রাজবাড়ীতে হৈ হৈ রৈ রৈ কান্ড বেধে যায়। সবাই চেচিয়ে উঠল গেল গেল, সব গেল, জাত গেল, ধর্ম গেল, বলে। ক্রোধান্ধ রাজা ধরে আনলেন বুরহানউদ্দিনকে।

চিরদিন দেখা গেছে যে শয়তান সত্য-সাম্য-ন্যায় তথা শান্তির অনুশাসনকে সহ্য করতে পারেনা। তাই সে মানুষকে সত্য থেকে বিচ্যুত করার জন্য গরু পুজা ও গুরু পুজায় মাতাল করে দেয়। তদানিন্তন গৌড়েও তাই ঘটেছিল। গৌড়ের রাজা গবিন্দের কাছে গরু ছিল দেবতা অথচ বুরহানুদ্দিনের কাছে গরু ছিল একটি সাধারণ খাদ্য। এই উপমহাদেশের কিছু সংখ্যক মানুষ বাদে গোটা পৃথিবীর প্রায় সকল মানুষই গরু খায়। কিন্তু হলে কি হবে? গো-হত্যার অপরাধে অজ্ঞান রাজা বুরহানুদ্দিনের হাত কেটে দিলেন এবং তার নবজাত পুত্রটিকেও হত্যা করলেন। সোনার গাঁয়ের শাসক শামসুদ্দিন ইলিয়াস গৌড় গবিন্দকে শায়েস্তা করার জন্য একদল সৈন্য পাঠালেন। কিন্তু তারা পরাজিত হয়ে ফিরে গেল। বুরহানুদ্দিন ছুটে গেলেন দিল্লীর আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহের দরবারে নালিশ জানাতে। সম্রাট একদল সৈন্য পাঠালেন,

কিন্তু তারাও হেরে গেল। বুরহানুদ্দিন আবারো ফিরে গেলেন দিল্লীতে। সম্রাট আবারো একদল সৈন্য পাঠালেন গৌড়ে।

এই সময়ে দরবেশ জালালুদ্দিন (শাহজালাল) কয়েক শত সহকর্মী সাথে নিয়ে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষে এসেছিলেন। এলাহাবাদের কাছে বুরহানুদ্দিন দরবেশের সাথে দেখা করে তার উপরে কৃত অমানবিক অত্যাচারের কথা জানালেন। এসব কথা শুনে দরবশে যার-পর নাই মর্মাহত হলেন এবং শাহী কাফেলার সাথে গৌড়ে আসার সিদ্ধান্ত নিলেন। কাফেলা গৌড়ে এল। কিন্তু কি আশ্চর্য। গৌড়ের রাজা গোবিন্দ এবার যুদ্ধ না করেই পালিয়ে গেলেন এবং গৌড়ের রাজধানী সিলেট বিনা যুদ্ধে বিজিত হল।

কার্যতঃ এ ছিল এক অপরূপ ঘটনা। কেননা শাহজালাল শুধু যে তিন শতাধিক দরবেশকে সাথে নিয়ে এসেছিলেন তা-ই নয়, তিনি সাথে করে এক খন্ড মাটিও এনেছিলেন। কথিত আছে, তিনি সত্য প্রচারের উদ্দেশ্যে ঘর ছেড়ে বের হয়ে আসার সময়ে তার ওস্তাদ তার হাতে এক টুকরো মাটি দিয়ে বলেছিলেন যে, যেখানে যেদেশে এই মাটির সমতুল্য মাটি মিলবে তিনি যেন সেখানে বসতি স্থাপন করেন।

এই মাটির টুকরোই সেদিন অসাধারণ কম্প্যুটারের মত কাজ করেছিল। শাহজালাল বহু দেশ ভ্রমণ করেছিলেন কিন্তু আর কোথাও এই মাটির সমগুণসম্পন্ন মাটির সন্ধান পাননি। অবশেষে সিলেটে আসার পর এখানকার মাটি পরীক্ষা করে দেখেন যে, এই সেই মাটি এতদিন ধরে তিনি যার সন্ধান করছিলেন।

আমরাও বলি হ্যাঁ, এই সেই মাটি- দরবেশ শাহজালালের শেষ মনজিল, যার নাম জালালাবাদ। আর এই সেই মানুষ এই পুর্বাচলের কৃষক, শ্রমিক, বুদ্ধিজীবি, শাহজালালের উত্তরসুরী ও উত্তরাধিকারী এবং এই সেই যুগ, যে যুগে আমাদেরই কর্ম কর্তব্য সাধনায় এক নতুন জগতের বুনিয়াদ গড়ে উঠতে পারে।

জালালাবাদ শুধু একটি ভুখন্ডের নাম মাত্রই নয়, বরং এর সাথে একটি জীবনাদর্শেরও এদেশে আগমনের ইতিবৃত্ত জড়িত আছে। আজকের এই চলমান বিশ্বে ধনতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদ, ধর্মহীন সমাজবাদ, বর্ণবাদ, উপনিবেশবাদ ও ইহুদীবাদ লুটেরাদের "ভাগ কর ও শোষণ কর" এই মতবাদের প্রতিক্রিয়ায় বিশ্বব্যাপী যে অনল কুন্ড সমুহ তৈরী করা হয়েছে, এদের সবকটিই করা হয়েছে কার্যতঃ পরাশক্তি সমুহের যুদ্ধাস্ত্র ও শিল্পজাত দ্রব্যাদি বিক্রি করার প্রয়োজনে, অবাধ বাজার তৈরী করার উদ্দেশ্যেই। এরা বিভিন্ন দেশ জাতি ও অঞ্চলকে বিভিন্ন ছুতায় খন্ডিত করে মানুষে মানুষে হিংসা বিদ্বেষ, হানাহানি সাম্প্রদায়িক হীনমন্যতা ও আঞ্চলিক সংকীর্ণতার প্রলেপ দিয়ে জনজীবন বিষায়িত করে তুলছে। এসব বিভাগ প্রক্রিয়ার কোনটাই সাধারণ মানুষের কল্যানে করা হয়নি। বরং এর সব কটিই করা হয়েছে কার্যতঃ শোষকদের স্বার্থকে স্থায়ী করে রাখার জন্য।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধত্তোর পৃথিবীতে এভাবে জার্মানী, কোরিয়া, চীন, ভিয়েতনাম, কাশ্মীর ফিলিস্তিন ও ইয়েমেনকে খন্ডিত করা হয়। ইতিহাসের এরূপ একটি জঘন্যতম কারসাজি হল, গনভোটের মাধ্যমে অর্জিত গণরায়কে উপেক্ষা করে সিলেট তথা জালালাবাদের খন্ডিতকরণ। শোষকদের স্বার্থে কৃত এই বিভাজন যে অন্যায় তাতে দ্বিমতের অবকাশ নেই। তাই এই সব অন্যায় বিভাজন শেষ পর্যন্ত নস্যাত হয়ে যেতে বাধ্য। এ কারণেই আজ জালালাবাদের একত্রিকরণের দাবী উঠেছে। এই দাবী শুধু জালালাবাদের এপারের খন্ডেই উঠেনি উঠেছে ওপারেও। কেননা হযরত শাহজালাল (রাঃ) যে আদর্শ নিয়ে এ মাটিতে আসেন সে আদর্শ যেমন অবিভাজ্য তেমনি তার মাটিও অবিভাজ্য এবং তার আদর্শও এ মাটির মধ্যকার সম্পর্ক অবিভাজ্য। অতএব এ মাটির দ্বিধাবিভক্তি এবং তার আদর্শের পৃথকীকরণ অবশ্যই কৃত্রিম। আর কৃত্রীম বলেই তা স্থায়ী বা গ্রহণযোগ্য হতে পারেনা।

অখন্ড জালালাবাদ তথা বৃহত্তর জালালাবাদের চিন্তা বা দাবীর সাথে ১৯৪৭ সালের বিভাগ পরিকল্পনার কোন বিরোধ নেই। কেননা মুল বিভাগ পরিকল্পনা অনুযায়ী পুরো জালালাবাদেরই তদানীন্তন পাকিস্তানের পুর্ব অংশ তথা বর্তমান বাংলাদেশের অংশ হওয়া উচিত। যেহেতু গণভোটের রায় ছিল তা-ই। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। তাই এই ঐতিহাসিক অন্যায়ের অবসান ও জালালাবাদের অপর অংশের মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের স্বীকৃতি অপরিহার্য। জনগণ ভোট দেবে, আর কিছু সংখ্যক মানুষ চিরকাল ভেটো দিয়ে তা উল্টে দেবে - এ হয় না, হতে পারেনা, হওয়া উচিত নয়।

কার্যতঃ র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদ ছিল একটি ষড়যন্ত্রমুলক দলিল। তাই র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদের বর্ডার বিভাগ এভাবে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হওয়ায় আশ্চর্যের কিছুই নেই। মরহুম জননেতা আব্দুল হামিদ খাঁ ভাসানী তার জীবদ্দশায় বহুবার এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন। ১৯৮১ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের একজন প্রার্থীর ৯ দফা দাবীর মধ্যে একটি দাবী ছিলঃ "ভারতের কাছাড় ও করিমগঞ্জকে অন্তর্ভুক্ত করে বৃহত্তর জালালাবাদ প্রদেশ গঠন করা।"

ইদানিং দেশের ও বিদেশের বিভিন্ন পত্র পত্রিকায়ও এ সম্বন্ধে লেখালেখি চলছে। ১৯৮০ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর তারিখে দৈনিক ইত্তেফাকে এক উপসম্পাদকীয়তে বাংলাদেশের বন্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে বলা হয়। "এই অবস্থায় আজ হোক বা কাল হোক, র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদের বর্ডার বিভাগ চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে বাধ্য। কিন্তু যতদিন তা না হচ্ছে, ততদিন বাংলাদেশের বর্তমান সীমানার মধ্যেই বন্যা নিয়ন্ত্রণের সামগ্রিক পরিকল্পনা গ্রহণ ছাড়া গত্যন্তর নেই।"

পরবর্তীতে ঐ একই পত্রিকায় একই কলামে আবার লেখা হয়ঃ "একথা বলছি মাত্র একটি কারণে যে, দক্ষিণ তালপট্টি সমস্যাটা মোটেও নতুন নয়। অতি পুরাতন একটি গান, নতুন তালে গাওয়া হচ্ছে মাত্র। বেরুবাড়ী কি অনেক আগেই আমাদের হাতছাড়া হয়ে যায়নি? দহগ্রাম? কিংবা তামাবিল এলাকার সীমান্ত? ১৯৪৭ এ সেই বিখ্যাত র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদে কি হয়েছিল? গোটা মুর্শিদাবাদ, সিলেটের করিমগঞ্জ আমাদের ভাগে আসার কথা ছিল। কথা ছিল নদীয়া জেলাও পড়বে আমাদের ভাগেই। কেননা যে নীতির ভিত্তিতে পার্টিশন প্রস্তাব ছিল, সেই নীতিই নির্ধারিত করে দিয়েছিল বাউন্ডারী। কিন্তু কোথা দিয়ে কি হয়ে গেল, র‍্যাডক্লিফ সাহেব তার রিপোর্ট পেশ করে হোমে ফিরে গেলেন। রিপোর্ট প্রকাশ পেল অনেক পরে। দুর্মুখের অভাব কোন কালেই হয় না। কলিকাতার কম্পেনসেশন তো দুরের কথা, মুল রিপোর্ট অনুযায়ী বাউন্ডারী পর্যন্ত বানচাল হয়ে গেল। কে বা কারা, কে বা কাদের, কি বা কিসের জোরে হাত করে নিল রেডক্লিফ রোয়েদাদের মধ্যে যে কী বিস্তর অদল-বদল ঘটল তা এক অপেন সিক্রেট। আসলে টাকায় কি না হয়। "মথ ইটেন কান্ট্রি" বলে অভিযোগ তোলা হল। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। পরবর্তীকালে কেউ টু শব্দটি পর্যন্ত করলেন না। পাকিস্তান ভেঙ্গে বাংলাদেশ হল। ধারণা করা হয়েছিল, এবার আদি এবং মুল রেডক্লিফ রোয়েদাদ প্রকাশের দাবী উঠবে এবং সেই মোতাবেক নতুন করে নির্ধারিত হবে নব প্রতিষ্ঠিত বাউন্ডারী। কিন্তু সেই আগের খেলা অব্যাহত রইল। নতুবা আজ যে ফারাক্কা নিয়ে কথা উঠেছে, সেই গোটা ফারাক্কা এলাকাটাই বাংলাদেশের ভাগে পড়ার কথা। আজ সিলেট সীমান্ত নিয়ে কথা উঠে। অথচ আস্ত মহকুমা করিমগঞ্জ আস্তে ছেড়ে দিয়ে এসে এখন শুধু বুড়ো আঙ্গুল চুষতে হচ্ছে।"

বিগত ২৬ শে জানুয়ারী (১৯৮২) তারিখে একই কলামে আবারো লেখা হয়ঃ "... কোন কোন মহল মনে করেন যে, এই র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদের কথা তুলে ধরে, এই সব মহল প্রকারান্তরে ভারত বিভাগকে অস্বীকারই করতে চাইছেন। তবে আমাদের ধারণা, রেডক্লিফ রোয়েদাদের কথাই যদি উঠানো হয়, তাহলে বাংলাদেশের তাতে সায় দেয়া উচিত। কেননা রেডক্লিফ কাদের ক্রীড়নক ছিলেন এবং কাদের চক্রান্তে পড়ে সেই ভারত বিভাগের সময় পোকায় খাওয়া পাকিস্তান আমাদের ভাগে পড়েছিল, তা ইতিহাসের এক জলজ্যান্ত বিষয়। সুতরাং আজ যদি তেমন প্রশ্ন উঠেই, তবে সংগত কারণেই বাংলাদেশ বিভাগ পুর্ব সময়কার গোটা বাংলার উপরেই হয়ত বা তার ন্যায্য দাবী সুপ্রতিষ্ঠিত করার সুযোগ পেয়ে যেতেও পারে।"

উপরোক্ত বক্তব্যটি কার্যত কলকাতার তথাকথিত "নিখিল বঙ্গ নাগরিক কমিটির" পক্ষ থেকে বাংলাদেশের ২০ হাজার বর্গ মাইল এলাকার দাবীসহ ভারতে বসবাসকারী কতিপয় সাবেক পুর্ববঙ্গবাসী নাগরিকদের (?) বাংলাদেশ বিরোধী বক্তব্য ও কর্মকান্ডের প্রেক্ষাপটে লেখা হয়েছিল।

তবে একটি কথা যা এখানে সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে তা'হল এই যে, এপারেই হোক বা ওপারেই হোক, পুর্বাচলের মানুষ হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান সকলেই আজ ভি, পি, মেনন ও মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনার প্রেক্ষাপটে কৃত বিভাজনের অভিশাপে সমভাবে জর্জরিত। তাই বিচ্ছিন্নভাবে হলেও তারা ভিন্ন ভিন্নভাবে নিজ নিজ সুবিধামত সমাধানের প্রস্তাব দিয়ে বিভাগ পরিকল্পনাকে উড়িয়ে দিতে চাইছেন। তাতে সমস্যাটি প্রকট হয়ে উঠছে ঠিকই, কিন্তু প্রকৃত সমাধানের উপায় কেউ বাতলাতে পারছেন না।

১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে অনুষ্ঠিত গণভোটে জালালাবাদের ভোটদাতা নাগরিক তথা হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রীষ্টান সবাই অংশগ্রহণ করেছিলেন। গণভোটের ফলাফল ঘোষনার পরে ১২ই আগষ্ট থেকে ১৪ই আগষ্ট পর্যন্ত তিনদিন সারা জেলার অন্যান্য অংশের নাগরিকদের মত করিমগঞ্জ, বদরপুর, রাতাবাড়িও পাথারকান্দির লোকেরাও উৎসব মুখর ছিলেন। কিন্তু চক্রান্তকারীরা বসে থাকেনি। তারা তাদের হীন উদ্দেশ্যকে চরিতার্থ করার জন্য শুধু ষড়যন্ত্র ও ঘোষ

প্রদান করেই বিরত থাকেনি, বরং এ ব্যাপারে সুন্দরী মহিলাদেরকে পর্যন্ত নিয়োগ করেছিল। এইভাবে এক ঘৃণ্যতম ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে তারা সিলেট জেলার পূর্বাঞ্চলকে কেটে নিয়ে কাছাড়, করিমগঞ্জ ও ত্রিপুরার মানুষের সর্বনাশ ঘটিয়েছিল। তবে এব্যাপারে একটি সুখবর এই যে, এই জগা-খিচুড়ী খন্ডিতকরণের ব্যাপারে এই অঞ্চলের সাধারণ মানুষ জড়িত ছিলেন না। কার্যতঃ এই ষড়যন্ত্রের নীল নক্সা রচনাকারী প্রধান নায়কদের ক'জন ছিলেন বৃটিশ এবং অন্যরা ছিলেন উত্তর-ভারতীয় শোষকদের প্রতিভূ প্রধান।

আশ্চর্য! র‍্যাডক্লিফ সাহেবের নামে এই যে জাল বানোয়াট ও দুরভিসন্ধিমূলক দলিলটি রচনা করা হয়েছিল কার্যতঃ তিনি তার আগা-মাথা কিছুই জানতেন না। বোধ হয় ষড়যন্ত্রের স্বরূপ দেখে তারও বিবেক শিউরে উঠেছিল। আর সম্ভবতঃ এ কারণেই এই রায় বা রোয়েদাদ ঘোষিত হওয়ার অনেক আগেই তিনি মানে মানে তড়িঘড়ি দিল্লী ছেড়ে স্বদেশের পথে পাড়ি দিয়ে কেটে পড়েছিলেন।

পশ্চিমে পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর জেলাকে এবং একইভাবে পূর্বাঞ্চলে করিমগঞ্জ মহকুমাকে একান্ত অন্যায়ভাবে কেটে নেয়া হয়। যথাক্রমে কাশ্মীর ও ত্রিপুরা রাজ্যকে ভারতভুক্ত করার পূর্ব পরিকল্পিক ষড়যন্ত্রকে বাস্তবে রূপদান এবং এতে ভারতকে কৌশলগত সুবিধা দেয়ার জন্য।

এভাবে জালালাবাদকে দ্বিখন্ডিত করার ফলে যারা পাথারিয়া পাহাড়ের এধারে বাংলাদেশের সিলেট জেলায় বাস করে তারা যেমন নানা রকম বঞ্চনার শিকার হয়েছে তেমনি দুর্দশাগ্রস্ত হয়েছে হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খৃষ্টান নির্বিশেষে ওপারের লোকেরাও। উপরন্তু যেসব হিন্দু, উত্তরভারতীয় শোষকদের এই কপট কুটিল হাতছানিকে বিশ্বাস করে নিজেদের ভিটেমাটি ও লোটা কম্বল বিক্রি করে দেশত্যাগ করেছিল এবং তাই দিয়ে জমি বাড়ী কিনে আসামের বিভিন্ন অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছিল, তারাও আজ বিপাকে পড়েছে। আসামের সাম্প্রতিক তথাকথিত "বিদেশী হঠাও আন্দোলনের" প্রবক্তাগণ এদের নাগরিক অধিকার, সম্পত্তি ক্রয় বিক্রয় ও সংরক্ষণের অধিকার, এমনকি তাদের চাকুরী ও কর্মসংস্থানের উপরেও হুমকি সৃষ্টি করেছেন।

চিরদিন শোষকরা যেমনটি করে থাকে, আসাম আন্দোলনের পিছনেও তা-ই হয়েছে। এখানেও মাড়োয়ারীদের অর্থ ও চক্রান্ত কাজ করে যাচ্ছে, কার্যতঃ সেখানে বসবাসকারী আসামী, বাংলাভাষী নাগা, মিজো, গারো, টিপরা, নেপালী, খাসিয়া ও মণিপুরীদের মাঝে পারস্পরিক হিংসা ও বিদ্বেষের বীজ পুতে তাকে পাকাপোক্ত করে রাখার জন্য। তাই আজকের আসাম আন্দোলন, পৃথক কাছাড় আন্দোলন, পশ্চিমবাংলা ও ত্রিপুরার কেন্দ্র বিরোধী প্রশাসন, এমনকি নাগা ও মিজো সমস্যা মুলতঃ কুখ্যাত র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদ ও ব্রাহ্মণ্যবাদী কুচক্রীদের অন্যায় খন্ডিত করণের প্রতিক্রিয়াজাত ক্ষোভ ও বেদনার বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

এই সমস্যাবলীর সমাধান মানবিক দৃষ্টিকোন থেকে হওয়া উচিত। কোন দেশে কেউই আজ আর নিজেদেরকে একমাত্র আদি বাসিন্দা বলে দাবী করতে পারেনা। আবহমান কাল ধরে মানুষের বহমান স্রোতধারা ও রক্তধারার সংমিশ্রণ হতে হতে আজ গোটা পৃথিবীর সকল ঐশ্বর্যের উপরে মানুষের সম অধিকার প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। উগ্রজাতীয়তাবাদের প্রলেপ দিয়ে বিশ্বের কোথাও কোথাও মানুষকে আজো বর্ণবাদের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত করে রাখতে চাইলেও আন্তর্জাতিকতাবাদ তথা সত্য নির্ভর মানবিকতা ক্রমেই প্রসার লাভ করছে। তাই এমন দিন হয়ত খুব দুরে নয়, যখন পৃথিবীর সকল চত্বর থেকে যাবতীয় সাম্প্রদায়িক, আঞ্চলিক, ভাষাগত ও বর্নভিত্তিক সংকীর্ণতাসহ শিরক-বিদআত-অজ্ঞানতার চির অবসান ঘটবে এবং এক মহান জগৎপতির সার্বভৌম ছত্রছায়ায় মানুষ মানুষের ভাই ও বোন হিসাবে শান্তিতে বসবাস করার মত পরিবেশ ও পরিস্থিতি গড়ে উঠবে।

বস্তুতঃ আসামে আসামবাসীদের প্রধান সমস্যা হল উত্তর ভারতীয় শোষন যদিও এর ক্ষতিকর দিক সম্বন্ধে আসাম, ত্রিপুরা ও পশ্চিম বাংলার মানুষ পুরো মাত্রায় সচেতন নয়। কার্যতঃ সেখানে প্রয়োজন ছিল তথাকথিত "বিদেশী খেদাও" নয়, বরং মাড়োয়ারী খেদানোর আন্দোলন, যেমনটি এখানে এই বাংলাদেশে ঘটেছিল।

পরন্তু সাবেক আসামের খন্ডিত ইউনিট সমূহের মাঝে যেখানে যত দ্বন্ধ ও অবিশ্বাস, সংঘাত ও সংঘর্ষ দানা বেধে উঠছে, তার প্রকৃত সমাধান নিহিত রয়েছে বর্ণবাদী কুশাসন ও শোষনের অবসান এবং সকল মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের স্বীকৃতি ও তার কার্যকরী বাস্তবায়নের মাঝেই। সত্যিকারের বিদেশী হটাবার আন্দোলন হয়ত অন্যায় নয়, কিন্তু ঘরের

মানুষকে বিদেশী বলাটা গুরুতর অন্যায়। প্রকৃত প্রস্তাবে, বিদেশী সেখানে কার্যতঃ তারাই, যারা পুর্বাচলের বাইরে থেকে এসেছে এবং এই অঞ্চলের মানুষের উপরে ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষন চালিয়ে যাচ্ছে।

অন্যের আভ্যন্তরীন ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামানো সম্ভব নয় অবশ্যই কিন্তু পৃথিবীর যেকোন চত্বরে মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার বিঘ্নিত হলে তাতে বেদনাবোধ করার অধিকার সকলেরই আছে। দক্ষিণ এশিয়ার মানচিত্রে সদ্য স্বাধীন একটি উদীয়মান জাতি হিসাবে আমরাও চাই পুর্বাচলের বিভিন্ন ইউনিটের মানুষ পুর্ণমাত্রায় স্বাধীনতা ভোগ করুক। একইসাথে চাই তাদের উপর থেকে ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষনের চির অবসান হোক। তাছাড়া এখানে ব্যাপারটা যদি নিছক অন্যের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার হত এবং এর পিছনে কোনরূপ কিন্তু না থাকত, তাহলে না হয় ভিন্নভাবে বিষয়টিকে দেখা যেত। কিন্তু এখানে যে ঐতিহাসিক অন্যায় নিহিত তার প্রতিবিধানের দাবী চিরন্তন ন্যায়, আর ন্যায় পুরানো হলেও ন্যায় থাকে।

একটি প্রশ্ন? খন্ডিত কাশ্মীরের উভয় অংশে পরস্পর পরস্পরকে ধ্বংস করে দেবার জন্য যে লাখ লাখ সৈনিক গত তিন দশকেরও অধিককাল ধরে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তারা কি ওখানে এভাবে কিয়ামত পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকবে কোন সমাধান ছাড়াই? এছাড়া ভারত মহাসাগরে পরাশক্তি সমুহের সন্তেহজনক ক্রিয়াকলাপ; আসাম, ত্রিপুরা, মেঘালয়, মিজোরাম, মনিপুর, নাগাল্যান্ড, পশ্চিমবঙ্গা, কেরালা ও পুর্ব পাঞ্জাবের অশান্ত পরিবেশ; ভারত, বাংলাদেশ ও নেপালকে নিয়ে যৌথ পানি নিয়ন্ত্রণের জন্য বাংলাদেশী প্রস্তাব ও তার বিপক্ষে ভারতের পাল্টা প্রস্তাব, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যকার সাম্প্রতিক অনাক্রমন চুক্তির প্রস্তাব এবং তা নিয়ে সীমাহীন সন্দেহ ও অবিশ্বাস । এসবই পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে তথাকথিত র‌্যাডক্লিফ রোয়েদাদের অন্যায় সীমানা নির্ধারণের অবাস্তবতা প্রমাণ করে। এভাবেই এটি সীমানা পুনঃনির্ধারণের সম্ভাবনাকে সহজ করে আনছে। তাছাড়া বাংলাদেশের নদী সমুহের সব কটির উৎস ভারতে, অন্যদিক সাবেক আসামের বিভিন্ন ইউনিট থেকে সমুদ্রের দুরত্ব অনেক। এই উভয়বিধ সমস্যার প্রকৃত সমাধান পেতে হলেও সত্য ও ন্যায়ের ভিত্তিতে উপমহাদেশের সীমান্ত রেখার পুনর্বিন্যাস ঘটাতে হবে।

বস্তুতঃ দিল্লীর বর্ণবাদী শাসন ও শোষনের ফলে পুঞ্জিভুত ক্ষোভ ও বেদনা ভারতবর্ষের এখানে ওখানে অসংখ্য বিষ ফোঁড়ার জন্ম দিয়ে চলেছে। দক্ষিণে তামিল নাড়ু আন্দোলন, পশ্চিমে খালিস্তান, পুর্বে মিজো ও নাগা সমস্যা, এমনকি সাম্প্রতিক আসামের "বিদেশী হঠাও আন্দোলন" এরই দৃষ্টান্ত। তাই এমন দিন সম্ভবতঃ শীঘ্রই আসছে, যখন এসব আন্দোলনের নেতারা তাদের সমস্যাবলীর প্রকৃত কার্যকারণ খুঁজে পেতে সক্ষম হবেন এবং এসব বিচ্ছিন্ন ঘটনাবলী তখন একটি সামগ্রিক আন্দোলনের রুপ নিয়ে এগিয়ে যাবে। তাতে কোন ব্যাক্তি, গোষ্ঠী ও পরিবারের ইচ্ছা ও স্বার্থ যাই হোক না কেন, দক্ষিণ এশিয়ার কোটি কোটি মানুষের বাঁচার তাগিদটাই তখন বড় হয়ে দেখা দেবে।

বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে বিশ্বের বিভিন্ন অংশের ও বিভিন্ন পরাশক্তির মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশে বসবাসকারী মানুষের মাঝে পাস্পরিক শান্তি ও সৌহার্দের প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন। ঠিক তেমনি এ উপমহাদেশে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যে ভারতের পুর্বাচলের বিভিন্ন ইউনিটের মাঝেও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। কিন্তু শাহজালালের পুণ্যভুমি জালালাবাদকে এভাবে খন্ডিত রেখে – এই শান্তি সম্ভব হতে পারে না।

অখন্ড জালালাবাদ কিংবা বৃহত্তর জালালাবাদের স্বপ্ন কোন ব্যাক্তি বা দলের কল্পনার ফসল নয়, বরং এটি ঐশী আশিষে সমন্বিত একটি সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের সুচনা মাত্র। হযরত শাহজালাল ছিলেন এর স্থপতি। তার সাথে যে সব দরবেশ এখানে এসেছিলেন, তারা সাবেক বাংলা ও আসাম তথা পুর্বাচল বা পুর্বভারতের সর্বত্র সত্য সাম্য ও ন্যায়ের পতাকা উড্ডীন করেছিলেন। শুধু তাই নয়, তিনি সাথে করে এনেছিলেন এক টুকরা মাটি ও একটি আদর্শ। এই মাটি ও এই আদর্শই "বৃহত্তর জালালাবাদের" পটভুমি। কিন্তু এও ঠিক যে শাহজালালের ইতিহাস শুধু এক টুকরা মাটি বা অঞ্চলের লড়াই মাত্র ছিলনা বরং সকল আঞ্চলিকতা ও সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতার উর্ধে এমন একটি জীবনাদর্শ তিনি নিয়ে এসেছেন যার প্রকৃত বাস্তবায়ন ঘটানো তার উত্তরসুরী এই আমাদের জন্য অপরিহার্য। কিন্তু এজন্য আমাদেরকে এখনো অনেক কাঠ খড় পোড়াতে হবে।

আগেই বলা হয়েছে যে, জালালাবাদের বিভাজন চিল একান্ত অন্যায়, অমানবিক এবং অগণতান্ত্রিক। তাই এই অন্যায় বিভাজন একদিন উড়ে যেতে বাধ্য। তবে এ ব্যাপারে আমাদেরও কিছু করণীয় আছে।

আমরা আজ এটুকু বলতে পারি যে, আমরা সেই মাটির সন্ধান পেয়েছি যার রূপরেখা একদিন ঐশী আশিষের মোড়ক হয়ে এসেছিল ফকিরের ঝোলায়। কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে, দরবেশ জালালুদ্দিন যে আদর্শ নিয়ে এখানে এসেছিলেন, তার সঠিক বাস্তবায়ন আজো হয়নি বা হতে পারে নি।

তাছাড়া আরো ভাববার বিষয় হচ্ছে শাহজালালের স্বপ্ন কি মুধু মাত্র গৌড়ের সীমানার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল? এই প্রেক্ষিতে শাহজালালের সঙ্গী সাথী ও সহকর্মীদের মাজার সমূহ কোথায় কিভাবে ছড়িয়ে আছে তাও খুঁজে দেখতে হবে। তাহলেই এ প্রশ্নের জবাব মিলবে।

আর শাহজালালের আদর্শ? সে তো পরিপূর্ণ ইসলাম। এর বিপরীতে ধর্ম ও দর্শনের নামে শিরক-বিদআত ও অজ্ঞানতার যে ব্যাপক প্রচলন আমাদের সমাজে হয়েছে সে তো সত্য মিথ্যার এক জগা-খিচুড়ী মাত্র। তা দিয়ে মানুষের কল্যাণ হয়না বা হতে পারেনা। তাই সর্ব মানবিক কল্যাণের স্বার্থে এই মিথ্যার নিগড়কে ভাঙ্গাতেই হবে এবং আমাদের জীবন, জীবিকা ও জীবন দর্শনের ব্যাপারে যেখানে যত শিরক ও বিদআত আছে তাকে নস্যাত করে দিতে হবে।

একথা অনস্বীকার্য যে, সুপ্রাচীন কাল থেকে ভারতবর্ষে দীন ইসলাম জারী ছিল। এমন কি যেহেতু পবিত্র কুরআনের বক্তব্য মতে আল্লাহ সকল জাতির কাছে নবী রসুল পাঠিয়েছেন। তাই ধরে নেয়া যায় যে, ভারতেও নবী রসুল এসেছিলেন।

ইসলাম অর্থ শান্তি। এই সত্য সাম্য ও ন্যায়ের ধর্ম প্রাচীনতম যুগে যে ভারতেও বিদ্যমান ছিল, তা কে অস্বীকার করতে পারবে? অবশ্য পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণরা তাদের গোত্রীয় শাসন ও শোষনকে বজায় রাখার জন্যে সত্য সাম্য ও ন্যায়ের ধর্মকে ভারতছাড়া করেছিল। তার পরিবর্তে তারা মহাপুরুষদের চরিত্রে অন্যায়ভাবে কালিমা লেপন করে, গরু পূজা ও গুরু পূজা দরগা-পূজা ও দুর্গাপূজাসহ অসংখ্য শিরক ও কুসংস্কারের অবতারণা করেছিল। তারা যেমন বৌদ্ধ ধর্মের মাঝে বুদ্ধমূর্তি সংযোজন করে বৌদ্ধধর্মের বারোটা বাজিয়েছিল, ঠিক তেমনি মুসলমানদের সমাজ ব্যবস্থায় পীর পূজা ও কবর পূজা, ব্যাক্তিবাদ ও ব্যাক্তিপূজা, কুর্ণিশ ও কদমবুচি এবং কবরে মিনারে ফুল চড়ানোর রীতি রেওয়াজসহ এমন অনেক শিরক ও বিদআতের অনুপ্রবেশ ঘটাতে সাহায্য করেছিল তা ইসলামে আদৌ নেই। কার্যতঃ সুদুর অতীতে ভারতে একেশ্বরবাদ তথা ইসলাম জারী ছিল। আজ আবারও এখানে ইসলামকে পুর্ণ মাত্রায় প্রতিষ্ঠা করতে হলে এসব তথ্য বা তত্ত্বাবলীকে জানতে হবে।

একটি কথা যা এখানে একান্ত প্রনিধানযোগ্য তাহল, ব্রাহ্মণরা শুধু যে হিন্দুদের মাঝেই ছিলেন বা আাছেন এমনও নয় এবং তারা যে শুধু হিন্দুদেরই সর্বনাশ করে যাচ্ছেন তাও নয়, বরং তারা সর্বত্র ও সর্বকালে বিরাজমান। পীর পুরোহিত ও পাদ্রী সেজে এরা বিভিন্ন ধর্মের মানুষকে শিরক বিদআত ও অজ্ঞানতার আফিম খাইয়ে অন্ধ করে রেখেছে। তাই সর্বধর্মে বিরাজিত এই সর্বনাশী পৌরহিত্যবাদকে নস্যাত করে দিতে হবে। কার্যতঃ সর্ব মানবিক কল্যাণের স্বার্থে এবং সত্য সাম্য ন্যায় ও বিজ্ঞানভিত্তিক জীবনাদর্শ ইসলামকে সারা বিশ্বে প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করার জন্যই এসব কাজ করতে হবে।

মোটকথা, আমরা ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেব। সপ্তদশ অশ্বারোহীর বঙ্গবিজয় কোন অলীক ঘটনা ছিলনা। তেমনি এ যুগেও তা সম্ভব হতে পারে। তবে এর জন্য একদল আত্মত্যাগী মুজাহিদ ও যোগ্য নেতৃত্বের প্রয়োজন। এরূপ ঘটনা অতীতে সিলেটের মাটিতেও ঘটেছিল। দুই দুইবার পরাজিত হওয়ার পরে তৃতীয় বার সিলেট অভিযানে আগন্তুক দিল্লীর শাহী কাফেলার সাথে দরবেশ জালালুদ্দিন তার ফকির বাহিনী নিয়ে এসেছিলেন। এখানে বুরহানুদ্দিন ও তার আত্মীয় পরিজনদের উপরে কৃত অন্যায় অত্যাচারের প্রতিকার কল্পে। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী, জালিমরা এবারে তাদের সামনে আসতে সাহসই পায়নি। কার্যতঃ সত্য মিথ্যার দ্বন্দ্ব ও তার সমাধান চিরদিনই এভাবেই হয় বা হয়েছিল এবং ভবিষ্যতেও তা এভাবেই হবে বা হতে থাকবে। কেননা সত্য জয়ী হতেই আসে এবং মিথ্যার দাপট চিরদিনই ক্ষণস্থায়ী।

তাদের মত ত্যাগ তিতীক্ষা, সত্য শিক্ষা ও চারিত্রিক দৃঢ়তা নিয়ে আপনারাও এগিয়ে আসুন। দেখবেন, শুধু মাত্র ধনবল, জনবল, সৈন্য সংখ্যা এমনকি মিগ মিরেজ বা তার চেয়ে অধিক শক্তিশালী মারণাস্ত্রের সংখ্যাধিক্যই নয়; বরং সত্যিকারের ঈমানের বলে বলীয়ান মরদে মুমিনরা যে কোন সময়ে যে কোন সংগ্রামের গতিধারা বদলে দিতে পারে।

কিন্তু এরূপ যে কোন সত্য সংগ্রামে অংশগ্রহণ খুব সহজ নয়। এজন্য সর্ব প্রকার নেশা, দুর্নীতি ও কুসংস্কার তথা শিরক বেদআত অজ্ঞনতাকে পরিহার করে চলতে হবে। এবং ব্যাক্তিগত জীবনে আল্লাহর অনুশাসন মেনে চলতে হবে। প্রশ্ন

হচ্ছেঃ এত সব ঝামেলা কি আমরা মেনে চলতে পারব? হ্যাঁ, কেন পারব না? আমরা মানুষ, আশরাফুল মখলুকাত। আমাদেরকে আইন মেনে চলতেই হবে। আমাদের সামনে দু'টি পথ আছে। দুটি গন্তব্যও আাছে - একটি জাহান্নাম, অপরটি জান্নাত। তৃতীয় আর কোন পথ নেই, আর কোন গন্তব্যও নেই।

বিশ্বের সর্বত্র সার্বিক শান্তি, ন্যায় বিচার, সত্য নির্ভর ও বিজ্ঞানভিত্তিক জীবনাদর্শ প্রতিষ্ঠা করার জন্য চৌদ্দশ' বছর আগে ইসলামের নামে যে বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল, তারই সন্দেস তথা সুদর্শন নিয়ে দরবেশ জালালুদ্দিন এসেছিলেন সিলেটে প্রায় সাতশ' বছর আগে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখ ও বেদনার কথা এই যে, দরবেশের আনীত জীবনাদর্শ আজ শিরক ও বিদআতে প্রভাবিত ব্যাক্তিবাদ, ব্যাক্তিপূজা কবর পুজা ও ওরশ শরিফে পর্যবসিত হয়েছে। ফলে সত্য সাম্য ও ন্যায়ের অনুশাসন তথা সার্বিক শান্তি প্রতিষ্ঠার সকল সম্ভবনাও আজ স্তিমিত।

হযরত শাহজালাল(রাঃ)র এক মুঠো মাটিকে কেন্দ্র করে ঐশী ইচ্ছাকে পূর্ণ করার জন্য সিলেটে এই বাংলারই এক অংশে এসে তার পথ চলা শেষ করলেন। এর আরো একটি গুঢ় তাৎপর্য আছে। তা হচ্ছে সারা বিশ্বের সর্বত্র বিশেষতঃ এই উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের গণ মানুষের সার্বিক মুক্তি আনার লক্ষ্য অর্জনে বাংলার মানুষকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে।

কিন্তু প্রচলিত শিরক, বিদ'আত ও পবিত্র ওরশ মুবারকের স্বঘোষিত মহিমায় (?) এই বাংলার মানুষের ধর্ম দর্শন আজ বিকৃতির অতলে ডুবতে বসেছে। এই অবস্থার অবসান ঘটাতে হবে। এরুপ যে কোন বিপ্লবে প্রাথমিকভাবে অগণিত মানুষের প্রয়োজন হয়না। বদর যুদ্ধে ৩১৩ জন সত্য সৈনিক কিংবা সিলেট যুদ্ধে আগত ৩৬০ জন দরবেশের দৃষ্টান্ত স্মরণ করলে দেখা যায় যে, সত্যিকার ঈমানের বলে বলীয়ান মুষ্টিমেয় মানুষ চিরদিন ইতিহাসের গতিধারা বদলে দিয়েছেন। এর জন্য যেমন প্রয়োজন একটি সুদর্শন তথা একটি সত্য নির্ভর নীতি আদর্শের, তেমনি প্রয়োজন একদল আদর্শ চরিত্রের অধিকারী মানুষেরও। আমাদের হাতে সু-দর্শন আছে ঠিকই, কিন্তু আমাদের এই বিশাল জনসমুদ্রে প্রকৃত মানুষের যে অভাব আছে, এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। তাই এই 'মানুষ' গড়ার কাজেই আমাদেরকে আত্মনিয়োগ করতে হবে।

লেখক পরিচিতি: প্রবন্ধটির লেখক সিলেটের একজন বাসিন্দা তার নিজের লেখা বই যেটি ১৯৮২ সালে প্রকাশিত হয় তা থেকে সংগ্রহ করা হয়। লেখক নিজে আসাম প্রদেশের করিমগঞ্জের বাসিন্দা ছিলেন। উপরোক্ত লেখাটিতে একজন ভুক্তভোগী হিসাবে নিজের চোখে দেখা অভিজ্ঞতার কথা, রাজনৈতিক জটিলতার কথা, ভুভাগের কথা উঠে এসেছে। তার জন্ম ১৯২২ সালে এবং তিনি মারা যান ১৯৯৫ সালের ১০ই মার্চ তারিখে। উল্লেখ্য একজন চিকিৎসক হিসাবে তার রোগীদেরকে কাছে থেকে দেখে তিনি ১৯৭২ সালেই "বাংলাদেশ তামাক বিরোধী আন্দোলন" নামে ধুমপানের বিরুদ্ধে একটি আন্দোলন শুরু করেন।